চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার, ক্ষমতায়ন, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি-

রবিউল ইসলাম

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

১। মোল্লারা একটি ডাহা মিথ্যে কথা জাতিকে শুনিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে নারীরা পিতা ও স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকেই নাকি সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে। এর মধ্যে যে কতবড় ফাঁক রয়েছে, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। বাংলাদেশের কয়জন নারী তাদের পিতার সম্পত্তি(কোরান বর্ণিত এক তৃতীয়াংশ) থেকে লাভবান হচ্ছেন ? সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, ভাইরাই বোনদের অংশটুকু ভোগ করে থাকেন, যে মোল্লারা এই ইস্যু নিয়ে হৈচৈ করছে তারাও এর বাইরে নয়। অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আমার আত্নীয়স্বজনের মধ্যেই এর উদাহরণ রয়েছে। বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সম্পত্তি নিয়ে যারা কিছুমাত্র খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন যে প্রায় ক্ষেত্রেই, বোনেরা তাঁদের অংশটুকু ভাইদের ছেড়ে দেন। যেমন, আমার গরীব আত্মীয়ারা তাঁদের পিতৃসম্পত্তির অংশটুকু শহরে বাসরত অবস্থাপন্ন ভাইদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভাইদের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা কিছু Compensation -এর বিনিময়ে দিয়ে দিয়েছেন। অথচ, আগেই বলেছি, কথিত ঐ ভাইয়েরা বেশ অবস্থাশালী। মোল্লারা কি এই বাস্তব ব্যাপারটা জানেন না ? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তবুও তাঁরা ভন্ডামী করে চলেছেন

২) মোল্লারা যে যুক্তিটি সবসময় দিয়ে থাকেন তা' হল, কোরান নির্দেশ দিচ্ছে -'সম্পত্তির ক্ষেত্রে দুইজন নারীর অংশ একজন পুরুষের সমান '। তারা যুক্তি দেন-'নারীকে ভরনপোষণ ও রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে ।'-এটাও কোরাণের নির্দেশ (নির্দেশ নাকি উপদেশ সেটা উপরে আলোচিত হয়েছে)। এছাড়া এ সম্পর্কে অন্যান্য আয়াত বা দলিল কি বলে আমি একটু পরে আলোচনা করব। মোল্লারা যুক্তি দিচ্ছন, পুরুষ যেহেতু নারীর ভরনপোষন ও রক্ষণাবেক্ষন করবে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের কর্তৃত্বের দাবীদার হচ্ছে পুরুষ। তা' ছাড়া, মেয়েরা ত' পিতা ও স্বামী উভয় পক্ষ থেকেই সম্পদের অংশ পাবেন। তাহলে, এই যে লক্ষ লক্ষ মেয়ে গার্মেন্টস্-এ কাজ করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে, আবার কারখানা থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার সংসারের সমস্ত কাজগুলি করছে, -সেক্ষেত্রে কারা সংসারের হালটি ধরে আছে ? মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর অগণিত পেশাজীবি নারী অফিসের কাজ সেরে বাসায় এসে স্বামীদেরকে খাওয়ান, সংসারের বিভিন্ন কাজ সারেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ত বটেই, উন্নত দেশগুলিতেও বাস্তবতা হল, শুধু স্বামীর উপর নির্ভর করে সংসারনির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ, মোল্লারা প্রায় ১৫০০ বছর আগের সামাজিক কাঠামোকে এখনো মনোজগতে গেঁথে রেখে সে সময়কার পরিস্থিতিতে যেসব আয়াত নাজেল হয়েছে বা শরীয়ার (যা অনির্ভরযোগ্য) বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলিকে আজকের যুগে চালাতে চাইছেন কোনরকম সংস্কার না করে। তখনকার আরবের গোত্রবদ্ধ সমাজে রসূলুল্লাহ্‌র উত্থাণ ও সমাজসংস্কারের পূর্বপর্যন্ত মেয়েদের অবস্থা ছিল প্রায় দাসদের মতই। স্ত্রীরা এক গোত্র থেকে বা এক স্বামী দ্বারা (তালাকের মাধ্যমে) বিতাড়িত হলে অন্য গোত্র বা স্বামীর আশ্রয়লাভ করত দাসীর মর্যাদা নিয়েই। তাছাড়া তখনকার যোগাযোগব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্যও ছিল মৌসুমভিত্তিক ও এবং খুব অপ্রতুল। এই অবস্থায় পুরুষদের পক্ষেই কেবল দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সংসার ও গোত্রের অর্থনৈতিক চাকা ঠিক রাখতে হত। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেযুগে যে পুরুষকে আর্থিক কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তা সেযুগের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল। আর, বৈজ্ঞানিক,

সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং কাঠামোগত অনগ্রসরতার কারণে নারীর পূর্ণাঙ্গ সমানাধিকারের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র সমসাময়িক সমাজ প্রস্তুত ছিল না।

"আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত আনি"-বাকারা ১০৬। দেখা যাচ্ছ যে, খোদ কোরানেই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু মোল্লারা আমাদেরকে এ ব্যাপারে চিরকালই মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছে অথবা অন্ধকারে রেখেছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে।

"নসখ্(অর্থঃ কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন-কোরাণেও এটা আছে)-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজন হইতেই "- প্রিন্সিপল্‌স্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স-ড. হাশিম কামাল(সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, লেখক-হাসান মাহমুদ)। এই আলোকে দেখলে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের অনুসৃত ১৫৮০০ বছর পূর্বের আরব্য সমাজের উপযোগী শরীয়া বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে কোরাণসম্মত নয়, প্রযোজ্যও নয়।

"(শারীয়া)-তে সেই সমাজের বৈশিষ্ট আছে যে সমাজে শারিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।"-ইমাম শাফি, "রিসালা"-পৃষ্ঠা ৩(সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, হাসান মাহমুদ)।

এবারে পাঠক বিচার করে দেখুন, ১৪০০ পূর্বের একটি সমাজব্যবস্থার জন্য যে 'সদুপদেশ' (বারবার বলছি- 'আইন' নয়) প্রযোজ্য ছিল, আজকের যুগে তা' প্রযোজ্য কিনা। এই নিরন্তর সমাজবিবর্তন ও পরিস্থিতিবদলের ব্যাপারটি আল্লা জানেন বলেই কোরাণকে আইন হিসেবে নবী (সঃ)-র কাছে পাঠাননি। চিন্তা করে দেখুন, কত অসংখ্য ধরণের সমাজকাঠামো আজ পর্যন্ত মানবেতিহাস পার হয়ে এসেছে-সমাজ কোন স্থির জড়বস্তু নয়। আমরা শুধু মোটাদাগের কয়েকটি উদাহরণ দেব-প্রস্তরযুগের যূথবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, পুজিতান্ত্রিক সমাজ, কল্যাণরাষ্ট্র। এখন, ধরা যাক, যদি কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ধরণের সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ্ নবী করীম (সঃ)-কে বাণী পাঠাতেন তাহলে কত লক্ষ পৃষ্ঠার কোরাণ লিপিবদ্ধ করতে হত ? সে কোরাণের আয়তনই (Volume) বা কী হত ? যে যুগে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়নি সেযুগের জন্য সেটা কি অবাস্তব ছিল না ? তাছাড়া, তখনকার অন্ধকার বর্বর যুগে, যখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান-শিক্ষা-মেধা ইত্যাদি বিকশিত হয়নি, সেযুগের মানুষের জন্য সেটা কঠিন হয়ে যেত নাকি ?

৩। কিছু বাস্তবভিত্তিক প্রশ্ন রাখতে চাই মোল্লাদের উদ্দেশ্য করে,-

ক) মোল্লারা বলছেন যে স্বামীর কাছ থেকে নারীরা সম্পত্তির অংশ বা হিস্যা পেয়ে থাকেন। কিন্তু যেসব স্বামীরা কথায় কথায় শরীয়তের নামে ফতোয়াবাজ মোল্লাদের প্ররোচনায় তিন তালাক বলে স্ত্রী তালাক দিচ্ছে গ্রামেগঞ্জে, তাদের জন্য কি উপায় ? এইসব নারীরা যদি পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা না মেনে, হিলা বিবাহের মত অবমাননাকর (গ্রাম্য সালিশিভিত্তিক বিচার-প্রহসন) না মেনে প্রভাবশালী পুরুষ ও মোল্লাদের ভোগের পণ্যমাত্র হতে অস্বীকার করে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় (অন্তত এই স্বাধীনতাটুকু তাদের রয়েছে, যা দিয়ে তাঁরা বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তাঁরা স্বাধীন সত্ত্বা ও স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ), শহরে পতিতাবৃত্তির জন্য যেতে বাধ্য হয় গরীব পিতার ভিটায় স্থান না পেয়ে, অথবা নিদেনপক্ষে ভাসমান মজুর হয়ে শহরের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁর জন্য দায়ী কারা ?

উত্তর হলো এক কথায় গ্রাম্য মহাজন-মাতবর শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনের সহযোগী ও স্বার্থরক্ষাকারী মোল্লাশ্রেণী। কারণ এটাই চলে আসছে এবং চলছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মোল্লাতন্ত্র

ও সমাজের ভয়ে, গ্রামবাংলার অগণিত সম্পন্ন ঘরের বাবা-মারাও তাদের কন্যাদেরকে প্রাইমারী স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে দেন না, বিয়ে দিতে বাধ্য হন। পরিণতিতে, শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অভাবে, হয় স্বামীর যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন সইতে না পেরে একসময় আত্নহননের পথ বেছে নেয়, অথবা স্বামীপরিত্যক্ত হয়ে দুঃসময়ের পরিস্থিতিতে পতিতাবৃত্তি র পথ বেছে নিতে হয়। ঐসব ভাগ্যাহতা নারী যদি পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পেতো অথবা বাপের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেতো, তবে তাঁরা সাধ করে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাতোনা, আত্মহননের পথ বেছে নিতো না। মোল্লাতন্ত্রই এর জন্য দায়ী।

মোল্লারা যদি এর দায় অস্বীকার করেন, তা হলে আমি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। মার্চ ত্রিশ, ২০০৭ সংখ্যার দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'নারচরের মহিলা সমিতির দারিদ্র জয়' থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের নারচর গ্রামের ঘটনা। পাশের গ্রামের ভূমিহীন কৃষক সিদ্দিকুর রহমান অভাবের তাড়নায় এলাকার এক দাদনদারের কাছ থেকে ঋণ নেন ৩ হাজার
টাকা। গরুর ব্যবসা শুরু করে মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ গুনতে গিয়ে ঋণ আর শোধ হয় না। পরের বছর দাদনদার এসে তার ঘরদোর খুলে নিয়ে যায়। দাদনদার আর কেউ নয়, পার্শ্ববর্তী কৈয়নি গ্রামের মওলানা (?) আইউব আলী। কল্পনা করুন একবার, একজন ফতোয়াবাজ মওলানার প্রকৃত পরিচয় হলো সে দাদনদার, খাস বাংলায় সুদখোর কাবুলিওয়ালা। ভেবে দেখুন, এসব মৌলানা নামধারী ফতোয়াবাজদের স্বেচ্ছাচারী-মনগড়া ফতোয়ার পরিণামে গ্রামের অসহায় দরিদ্র নারীদের ভাগ্যে কী গজব নেমে আসতে পারে।
যাই হোক, সিদ্দিক কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হন পাশের নারচর গ্রামের অবস্থাপন্ন রওশন আরার বাড়ীতে যার স্বামী একজন প্রকৌশলী। ঘটনাটি রওশন আরার নারীমনকে ব্যথিত করে। তবে, এ ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রওশন আরা দাদন ব্যবসার শিকার ও অভাবজর্জরিত অসহায় নারীদের সংগঠিত করে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন-'নারচরের মহিলা সমিতি'। .....সেটা ছিল বিনা সুদে ঋণ নিয়ে অবলম্বনহীন মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার সংগ্রামী পদক্ষেপ। ..... ৬০টি গ্রামের মোট ২ হাজার ৩৫ জন নারী তখন নারচর সমিতির সদস্য। হতদরিদ্র পরিবারের যে কোন সদস্য মাসে ১০ টাকা দিয়ে সমিতির সদস্য হতে পারেন। পরে সুবিধাজনক সময়ে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে কিছু একটা শুরু করেন। তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ অন্যরাও সেকাজে অংশ নেন। প্রথম আলো প্রতিবেদক যখন সরেজমিনে পরিদর্শন করছিলেন, তখন বিলকিসের স্বামী ও গ্রামের লোকের কাছে জানতে পারলেন যে নলকূপ বসানো নিয়ে মহিলা সমিতির উন্নয়নকাজে নারীদের অংশগ্রহন তথা সর্বোপরি সমিতিকে প্রতিরোধ করতে কোমর বেঁধে লেগেছিল তিনটি মহল -দাদনদার, মোল্লাতন্ত্র আর স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল। সুদখোর আর মোল্লারা মিলে গ্রামে সমিতিওয়ালাদেরকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। তাহলে দাদনদার-মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের সহযোগী শক্তি কারা ? উত্তর হলো এক কথায় ফতোয়াবাজ ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাতন্ত্র। তাদের অজুহাত কি ছিল ? নারীরা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু, আসল কারণগুলি কি ? তাদের আর দাসী বানিয়ে ইচ্ছমতো ব্যবহার করা যাবে না, সালিশির নামে মাতবরদের কাছে ঘন ঘন দাওয়াত কিংবা জমিজিরাত (আল্লার নামে দান) উসুল করা যাবে না- দুর্দশাগ্রস্থ একেকজন নারীকে মহাজনদের হাতে হিল্লার নামে তুলে দিয়ে কিছু রাত ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে মাতবরদের প্রিয়ভাজন হওয়া যাবেনা। প্রিয় পাঠক, এই হচ্ছে আমাদের মোল্লাদের চরিত্র। যারা সুদখোর-মহাজনদের সুদখোরির সহায়তা করে, তাদের কাছে আমরা ইসলামের বাণী শুনতে চাই না। (চলবে)